ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 274- 282
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.207

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘গল্পমালা’-র নির্বাচিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন

দীপশিখা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক, সন্দিকৈ বালিকা মহাবিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

ড. মিতা চক্রবর্তী, *তত্ত্বাবধায়ক ও প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 07.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Narendranath Mitra stands out as one of the significant figures in twentieth century Bengali fiction, particularly for his psychological short stories. His narratives vividly portray the realities of middle and lower-class life in Bengal while delving into the depths of the human mind. The tradition of psychoanalytical storytelling initiated by Rabindranath Tagore found fuller expression in the works of both Kallol and non-Kallol writers, with Narendranath Mitra and his contemporaries carrying it forward. Mitra's stories often explore the intricacies of human emotions and behavior. In representing human desires, frustrations, joys, sorrows, love, hatred and conflict, he frequently employed psychoanalytic perspectives. While at times influenced by Freud's theories, Mitra often relied on his own rational and scientific outlook. Many stories from his collection 'Galpamala' remain memorable for their psychological depth. Through them, he probed the complex inner lives of his characters with remarkable precision. This paper seeks to undertake a detailed analysis of this psychological dimension in Mitra's writings, with particular attention to selected short stories where such approaches are most evident.

Keywords: Narendranath Mitra, psychoanalysis, Rabindranath Tagore, Kallol writers, non-Kallol contemporaries, short stories

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অসংখ্য ছোটোগল্প-উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তবে নরেন্দ্রনাথের রচনশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর ছোটোগল্প। গল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য গল্পের বিষয়বস্তুর সাধারণত্ব। তবে সেই সাধারণের মধ্য থেকে অসাধারণত্বের উন্মোচনে, চেনা জগতের মধ্য থেকে অচেনা রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি অসাধারণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বিপুল গল্পসম্ভারে মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপায়ণ এবং চরিত্রের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আধুনিক জীবনে মনস্তত্ত্ব এক বহুল আলোচিত বিষয়। মানুষের আচরণ, কার্যকলাপ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নই হল মনস্তত্ত্ব। অর্থাৎ বাইরের ঘটনা মানুষের মনোজগতে যে সমস্ত নিগূঢ় অনুভূতি জাগায়, যার ফলে মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয়, তার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের নামই হল মনস্তত্ত্ব।মানবমনের অন্তর্জগৎ এবং চারপাশের বহির্জগতের মধ্যে রয়েছে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্র। মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয় এই যোগসূত্র স্থাপন করে। ফলে বহির্জগতের পরিবর্তন হলে অন্তর্জগতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়; আবার অন্তর্জগতে আলোড়ন হলে বহির্জগতের আবহও

বদলে যায়। উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ থিওডোর ফেকনার মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে ওই শতকে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অস্ট্রিয় মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দুটো বই 'The Interpretation of Dreams' এবং 'Psychopathology of Everyday Life' -এর ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হলে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ জাগে। বস্তুত এই দুটি বই মানবমনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে মানুষের মনের তিনটি স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন— চেতন, অবচেতন এবং অচেতন স্তর। চেতন মনের সংযোগ ঘটে জাগ্রত অবস্থায় মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে। অবচেতন ও অচেতন মনের সংযোগ স্থাপিত হয় মানুষের সুপ্ত অন্তর্জগতের অর্থাৎ অতীত স্মৃতি ও জৈবিক প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত এই তত্ত্ব বিশ শতকের আধুনিক বিশ্বের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তা পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র, সাহিত্য প্রভৃতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ-রীতির যথার্থ প্রয়োগ ঘটে বিশ শতকের গোড়া থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' (১৯০১) এবং 'চোখের বালি' (১৯০৩)-তে মনঃসমীক্ষণের প্রথম সফল প্রয়োগ ঘটে। প্রথমটি ছোটোগল্প এবং দ্বিতীয়টি উপন্যাস। তবে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে বাঙালি কথাশিল্পীরা সচেতনভাবে গ্রহণ করেন আরও পরে। বিশ শতকের কুড়ির দশকে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যিক ফ্রয়েড-নির্দেশিত মনস্তত্ত্বকে ছোটোগল্প-উপন্যাসে প্রয়োগ করতে তৎপর হন। শুরু হয় বাংলা মনোবিশ্লেষণমূলক কথাসাহিত্যের জয়যাত্রা। সেই সকল সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ। এঁদের সমকালীন সময়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অকল্লোলীয় লেখকেরাও মনস্তত্ত্বপ্রধান কথাসাহিত্যের সম্ভার নিয়ে এলেন। তারপর কুড়ি শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে আরও একদল বাঙালি তরুণ লেখক মনস্তত্ত্বমূলক ছোটোগল্প-উপন্যাস রচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তাঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পসমূহ মানবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম উপাদানে পরিপূর্ণ। নরনারীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্জগৎ উন্মোচনে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর গল্পে চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব ও মানসিক টানাপোড়েন নিখুঁত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলো আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তবে পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য এখানে 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড থেকে বেছে নেওয়া দুটি গল্প নিয়েই আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

উদ্দেশ্য:

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা'-র গল্পগুলো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসাধারণ উদাহরণ। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল গল্পগুলোর আলোচনার মাধ্যমে লেখকের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কুশলতার উপর আলোকপাত করা। সেই সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্লোক অন্বেষণে সিদ্ধহস্ত গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাও এই আলোচনার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়।

গ্রন্থ পরিচয়:

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা' আট খণ্ডে বিভক্ত এক সুবিশাল গল্পসংকলন। প্রথম সংস্করণের ক্রম অনুযায়ী 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং শেষ তথা অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০২০-এর এপ্রিল মাসে। প্রায় সাড়ে চারশোর কাছাকাছি গল্প নিয়ে এই সংকলনটি চব্বিশ বছর ধরে আনন্দ পাবলিশার্স নামক প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে।

পদ্ধতি: আলোচ্য গবেষণাপত্র রচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা-পদ্ধতি মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে বর্ণনামূলক গবেষণা-পদ্ধতিরও আশ্রয় নেওয়া হবে। তথ্য সংগ্রহে আকরগ্রন্থকে প্রাথমিক উৎস এবং সহায়ক গ্রন্থসমূহকে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ:

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ছোটোগল্পের মনস্তাত্ত্বিক ধারার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ বলতে মূলত চরিত্রের অন্তর্জগতের অনুসন্ধানকেই বোঝায় এবং এই ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সৃষ্টিকে ঘিরে বিভিন্ন সমালোচক মূল্যবান মন্তব্য রেখেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

> "দুর্জেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।"[১]

অন্যদিকে প্রখ্যাত সমালোচক সরোজমোহন মিত্র মন্তব্য করেছেন—

> "নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে আছে তারই প্রাধান্য।"[২]

প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর চরিত্রগুলোর মানসিক জটিলতা ও অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে 'গল্পমালা'-র প্রথম খণ্ড থেকে দুটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। গল্পগুলো হল 'যৌথ' ও 'রস'।

'যৌথ' গল্পটিতে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। বৌদি মল্লিকার প্রতি স্বরূপের অনুচ্চারিত প্রেম এক বিশেষ মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে স্বরূপ পঙ্গু। দাদা অনুরূপের কথায় ভাইপোর জন্য নারকেল গাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে নিচে পড়ে যাওয়ায় তার দুটো পাকেই অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়। এই দুর্ঘটনার জন্য অনুরূপ নিজেকেই দায়ী করে। প্রথমাবস্থায় সে স্বরূপের বিয়ে দিতে, তাকে কাজ পাইয়ে দিতে, সাংসারিক বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে তৎপর ছিল। আসলে ভাইয়ের জীবনে যে বিশাল ক্ষতি তার দ্বারা ঘটেছে, এই সমস্ত আচরণের মাধ্যমে তা কিছুটা হলেও পূরণ করে সে নিজে অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অনুরূপ নিজের কাঠের ব্যবসায় স্বরূপের শিল্পীপ্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছে। শিল্পী স্বরূপ তার দাদার নির্দেশে কাঠে নানা ধরনের কারুকার্য করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "স্বার্থবুদ্ধি হয়তো পরোক্ষ কাজ করেছে, কারণ শিল্প বিষয়টা স্বরূপ যেমন বুঝত, অনুরূপ ততটা নয়। প্রত্যক্ষ ভাবে অসহায় ভাই এর প্রতি কারুণ্য মিশ্রিত ভালবাসা ও কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ ও ছিল। কারণ তার ছেলের জন্যেই স্বরূপের এই অবস্থা।"[৩]

অনুরূপ স্ত্রী মল্লিকাকে স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। মল্লিকা যখন বিয়ে হয়ে তাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন তার সঙ্গে কাটানো স্বরূপের সেই অতীত অনেক আনন্দময় ও প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু চার সন্তানের মা মল্লিকার শরীর এখন ভেঙে গেছে, প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য আর নেই; সংসারের চাপে মেজাজও খিটখিটে হয়েছে। কিন্তু স্বরূপ মনে করার চেষ্টা করে মল্লিকা যেন আগের মতোই আছে। সে যেন জোর করে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। গল্পকার এখানে স্বরূপের মনোজগৎ সম্বন্ধে হদিস দিচ্ছেন—

> "স্বরূপের ব্যবহারে কোথাও যেন একটু মোহ আছে।"[৪]

একদিন মল্লিকা নিজের সৌন্দর্যক্ষয়ের উপলব্ধিতে স্বরূপের সামনে সংকুচিত হয়ে পড়ল। স্বরূপকে খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে তার মনে হল স্বরূপ যেন তার দিকে সেভাবে তাকিয়ে নেই। এখানে গল্পকার মনোবিশ্লেষণ করেছেন—

> "মোহ তার চোখ থেকে খ'সে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হল স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"[৫]

এখানে মল্লিকার মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। মল্লিকা তার সৌন্দর্যের প্রশংসা স্বামীর কাছে আশা করেনি, তাই তার সৌন্দর্যহানিতে স্বামীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও সে চিন্তিত নয়। কিন্তু দেওরের চোখে তার প্রতি মুগ্ধতা, তার সৌন্দর্যহানিতে সেই মুগ্ধতার অবসান— নিজের সৌন্দর্যকে ঘিরে স্বরূপের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মল্লিকার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ স্বরূপের মনেই শুধু বউদিকে কেন্দ্র করে দুর্বলতা ছিল না, মল্লিকার মনেও স্বরূপকে নিয়ে দুর্বলতা ছিল।

দাদা ও বউদির যত্নে ও সাহচর্যে স্বরূপ পায়ের অভাবের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দিন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বদলায়। স্বরূপের মনে এবার জেগে উঠেছে ভাইপো ও দাদার জন্য পা হারানোর ক্ষোভ। অনুরূপের চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে স্বরূপের নিজের গতিহীনতাজনিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এদিকে মল্লিকার শিশুসন্তানের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তার একেক সময় অসহ্য লাগে। সে বিরক্তি প্রকাশ করলে মল্লিকা সক্রোধে বলে ওঠে—

> "…. কি করব ভাই, মেরে তো আর ফেলতে পারি না।"[৬]

স্বরূপ উপলব্ধি করে, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কিছু বললে মল্লিকা রাগ করে ফেলে। এখানে এক মায়ের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। স্বরূপের মনে হয়—

> "তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তার নিজের দোষত্রুটিগুলিকেই নয়, তার সন্তানদের দোষ ত্রুটি সুদ্ধ ভালোবাসতে হবে।"[৭]

স্বরূপের এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তার মনোজগৎ উদ্‌ঘাটিত। যে মল্লিকার সঙ্গে সে একসময়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে, সেই মল্লিকা আজ তার সঙ্গে কখনও কখনও রুক্ষ ব্যবহার করে। সে বুঝতে পারে, আগের মল্লিকাকে পেতে হলে তার সন্তানদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে হবে। স্বরূপের দেখাশোনার ভার মল্লিকার উপর অর্পিত হলেও দাদা-বউদির অসুবিধার কথা ভেবে সে বউদিকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুরূপের সঙ্গে মল্লিকাকে থাকতে দিত না। হয়তো বা জল খাওয়ার অছিলায় সে মল্লিকাকে ডেকে পাঠাত। এখানে স্বরূপের মানসিক টানাপোড়েন প্রকাশিত। বিবেকের প্রভাবে সে বউদিকে দাদার কাছে যেতে বলত, কিন্তু মন মল্লিকার সান্নিধ্য-কামনায় তাকে আবার ডেকে নিত। মল্লিকা স্বরূপের মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে জল না নিয়ে এসেই জিজ্ঞেস করত স্বরূপের সত্যি কি খুব তৃষ্ণা পেয়েছে? স্বরূপ উত্তরে বলত—

> "হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এ যাত্রা মেটাতে হবে।"[৮]

স্বরূপের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার অন্তরশায়িত ভাব বেরিয়ে পড়েছে। এই জীবনে তার পক্ষে মল্লিকাকে সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয়, তার ভালোবাসার তৃষ্ণা অপূর্ণই থেকে যাবে; ফলে আপাতত জল পান করেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে। দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষায় স্বরূপের আঁতের কথা বেরিয়ে এসেছে। তবে এগুলো সবই পুরনো কথা। এখন সময়ের পরিবর্তনের ফলে মল্লিকার সাংসারিক ব্যস্ততা তাকে স্বরূপের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অনুরূপও তার ব্যবসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু স্বরূপই রয়ে গেছে এক জায়গায়। তার জীবনে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আজকাল মাঝেমধ্যে তার মনে নানা কথা উঁকি দেয়, যার দ্বারা তার মনোগহনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকাল দাদা-বউদির প্রতি তার মনে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে রাগ ও বঞ্চনার দুঃখ বড়ো হয়ে ওঠে। এখানে গল্পকার তার মনের হদিস দিয়েছেন—

> "…. একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্যে? — মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছা ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের নিজের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়।"[৯]

একদিকে যেমন অনুরূপ ও মল্লিকার প্রতি স্বরূপের মনে আন্দোলন চলতে থাকে, তেমনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব একটি সংসারের জন্য তার মন আলোড়িত হয়ে ওঠে।

একদিন স্বরূপ বায়নার একটা কাজ যথাসময়ে শেষ করতে না পারার ফলে অনুরূপ কর্তৃক তিরস্কৃত হল। তখন স্বরূপও প্রত্যুত্তরে তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিল—

> "…. কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন? এত আমি করব কার জন্যে? কে আছে আমার সংসারে?"[১০]

ভাইয়ের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত জবাবে আহত অনুরূপ এবার মল্লিকাকে বারণ করে দিল স্বরূপের ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মল্লিকা স্বামীর নিষেধকে অগ্রাহ্য করে স্বরূপের কাছে গিয়ে হাল্কা ভঙ্গিতে বলল, স্বরূপের ঝগড়া করতে হয় মল্লিকার সঙ্গে করুক। এবার মল্লিকার কথার প্রতিক্রিয়ায় স্বরূপের মনের গভীরে জমে থাকা রাগ ও ঘৃণা তার দৃষ্টিতে ও বক্র হাসিতে ফুটে উঠল—

"মল্লিকা কি ভেবেছে এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে?"[১১]

মল্লিকা যেন স্বরূপের মনের কথা বুঝতে পেরেছে, তাই তার আচরণ তীরের মতো তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। মল্লিকার সেই সময়ের মানসিক স্থিতি সম্পর্কে গল্পকার বলছেন—

"আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা।"[১২]

স্বরূপের ব্যবহারে অনুরূপ আহত হয়েছিল সত্য, কিন্তু মল্লিকার আঘাত গভীরতর ছিল। এদিকে অনুরূপের মনে আবার করে অনুশোচনা জাগল এই ভেবে যে সে তার কাজকর্মের ব্যস্ততায় স্বরূপের দিকে আলাদা করে নজর দিতে পারেনি। সে ঠিক করল, আবার নতুন উদ্যমে তাকে তার ভাইয়ের বিয়ের চেষ্টায় নামতে হবে। অন্যদিকে স্বরূপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে একটি মূর্তি নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে খোদাই করে চলেছে। আগে স্বরূপ নিজের জায়গায় বসেই হই-হুল্লোড় করত, তার হাসিতে ও উল্লাসে সমস্ত বাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু আজকাল স্বরূপ কম কথা বলে, মল্লিকাকে ডাকাডাকি কম করে। যদিও মল্লিকা আগের মতোই গৃহকর্ম করে, অনুরূপের কাঠের ব্যবসা আগের মতোই চলতে থাকে, কিন্তু স্বরূপের নিরানন্দে সমস্ত সংসার যেন নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পর স্বরূপ হঠাৎ জ্বর ও ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। মৃত্যু আসন্ন দেখে স্বরূপ দাদাকে তার অসম্পূর্ণ মূর্তিটা সম্পূর্ণ করতে বলল। অনুরূপেরও স্বরূপের মতো শিল্পীর হাত। ফলে স্বরূপের মৃত্যুর পর তার শেষ অনুরোধ রাখতে পাটের চট দিয়ে ঢাকা সেই মূর্তিটাকে বের করে আনা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কৃত হল যে মূর্তিটা মল্লিকার। গল্পের শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙাচোরা ক্ষ'য়ে-যাওয়া মল্লিকার নয়, দশ বৎসর আগের সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।"[১৩]

স্বরূপ তার শিল্পীসত্তাকে কাজে লাগিয়ে তার নীরব প্রেমকে রূপ দিয়েছে এই মূর্তির মধ্য দিয়ে। সে চেয়েছিল নিজের হৃদয়ের মাধুর্য মিশিয়ে সপ্তদশী মল্লিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। আসলে প্রথম যৌবনের মল্লিকাকে স্বরূপ কখনও ভুলতে পারেনি, তাকেই সে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করেছে। এদিকে নিজের প্রতিকৃতি দেখে মল্লিকা লজ্জায় হতবাক আর অনুরূপ ক্ষুব্ধ। স্বরূপের মুগ্ধতা মল্লিকার কাছে অজানা ছিল না; বরং সেটার উপলব্ধিতে তার মধ্যে স্বরূপের প্রতি দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে স্বরূপের গোপন প্রেমের এমন আকস্মিক প্রকাশ অনুরূপের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিশাল এক আঘাত ছিল। 'যৌথ' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তিন নরনারীর মানসিক উত্থান-পতন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে মনস্তত্ত্ববিদসুলভ দক্ষতায় তাদের মনঃসমীক্ষণ করেছেন। এই গল্পটি সম্পর্কে বিখ্যাত সাহিত্যকার তপোধীর ভট্টাচার্য মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করেছেন—

"সম্পর্কের আলো-আঁধার, রহস্যঘেরা কুয়াশা ও নিরুচ্চার সৌন্দর্যের বিষন্নতা: সমস্তই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর লেখক-জীবনের সূচনা-পর্যায়ের এই গল্পকৃতিতে।"[১৪]

'রস' গল্পেও তিন নরনারীর মনোজগতের অপার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক বিপত্নীক মোতালেফ রাজেক মৃধার তিরিশ বছর বয়সী বিধবা স্ত্রী সাধারণ চেহারার মাজুখাতুনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এই বিবাহপ্রস্তাবের নেপথ্যে কাজ করেছে মোতালেফের স্বার্থপর মানসিকতা। মোতালেফের পছন্দ এলেম শেখের আঠারো-উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে ফুলবানুকে। অন্যদিকে ফুলবানুও মোতালেফকে পছন্দ করে। কিন্তু এলেম শেখের একটাই দাবি, তার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে হলে দেনমোহরের টাকা হিসেবে পাঁচকুড়ি দিতে হবে মোতালেফকে। ফলে সে তার গূঢ় অভিসন্ধি কার্যকর করতে মাজুখাতুনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আসলে মোতালেফ ছিল রসের কারবারি, খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই। আর মাজুখাতুন ছিল রস পাটালি গুড়ে পরিণত করতে দক্ষ। একজন পাকা গাছি, আরেকজন পাকা কারিগর। ফলে মোতালেফের অভিপ্রায় ছিল মাজুখাতুনের তৈরি করা পাটালি গুড় বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেনমোহরের টাকাটা জোগাড় করে নেওয়ার। কিন্তু মোতালেফের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাজুখাতুন একেবারে অজ্ঞ ছিল। তার কাছে মোতালেফের প্রস্তাব যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রথমে সে রাজি হয়নি; কিন্তু মোতালেফের মন পরীক্ষা করতে জিজ্ঞেস করেছে দেশে কি তরুণী মেয়ের অভাব হয়েছে নাকি যে সে তার কাছে এসেছে। মোতালেফ তা বুঝতে পেরে প্রেমের অভিনয় করে বলেছে, মাজুখাতুন একেবারে আলাদা, তার সঙ্গে অন্য মেয়ের তুলনা হয় না।

মোতালেফের মধুর কথা মাজুখাতুনের মনকে ছুঁয়ে যায়। এর আগে পাড়ার পুরুষেরা যে এমন প্রস্তাব দেয়নি, তা নয়; কিন্তু মোতালেফকে সে অস্বীকার করতে পারে না। তার মানসিক অবস্থা গল্পকারের লেখনীতে ফুটে উঠেছে—

> "অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল।... পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।"[১৫]

এখানে একদিকে যেমন মাজুখাতুনের অতৃপ্ত যৌন মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তেমনি মোতালেফের প্রতি তার সদ্য জাগ্রত প্রেমের আভাসও ফুটে উঠেছে। বিয়ের পর মাজুখাতুন ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। মোতালেফ গ্রামের বিভিন্ন খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে আনে। আর মাজুখাতুন উঠোনে উনান কেটে তার উপর বড়ো বড়ো জালা বসিয়ে রস জ্বাল দেয় ও গুড় তৈরি করে। মাজুখাতুনের সারাদিন ধরে বিশ্রামের অবসর নেই, কিন্তু তার ক্লান্তিও নেই। সে যেহেতু মনের মতো স্বামী ও কাজ পেয়েছে, তাই তার কোনো কষ্টই গায়ে লাগে না। মাজুখাতুনের হাতের গুণে সেবার তাদের গুড় চড়া দামে বিক্রি হয় বাজারে। এমনাবস্থায় যেখানে মোতালেফের সুখে বিবাহিত জীবন কাটানোর কথা, সেখানে তার মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার গূঢ় অভিসন্ধি কার্যকর করার তাগিদ।

মোতালেফ গুড় বানাবার দক্ষ কারিগর মাজুখাতুনকে ব্যবহার করে পর্যাপ্ত টাকা জমিয়ে ফেলে। তারপর একদিন কিছু পাটালি গুড়, গুড়ের রস এবং পাঁচটি দশ টাকার নোট নিয়ে সে এলেম শেখের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ফুলবানুকে বিয়ে করার জন্য অগ্রিম টাকা দেয়। এলেম শেখ কোনো বিবাহিত ব্যক্তির কাছে মেয়েকে দিতে আপত্তি জানালে মোতালেফ বিবেকহীনের মতোই বলে ওঠে—

> "গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।"[১৬]

এখানে মোতালেফের মনোগহনে লুকিয়ে থাকা গোপন অভিসন্ধি, তার স্বার্থপর চরিত্র বের হয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত টাকা হাতে এলেই সে মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে তার আকাঙ্ক্ষার ধন ফুলবানুকে। এদিকে ফুলবানুও মোতালেফের কাছে অভিমান করে বসে মাজুখাতুনকে বিয়ে করার জন্য। এর উত্তরে মোতালেফ যা বলে তাতে তার কার্যসিদ্ধির জন্য মাজুখাতুনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের গোপন পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে—

> "ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।"[১৭]

অবশেষে দুই মাস পর গুড় বিক্রি করে আরও পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে দিল। অজুহাত হিসেবে সে সকলকে বলল, মাজুখাতুনের স্বভাবচরিত্র খারাপ। আহত মাজুখাতুন মোতালেফকে তিরস্কার করে বলে উঠল, তার চেহারাই শুধু সুন্দর, অন্তর নয়; তার মনে যে এত ছলচাতুরী ছিল তা সে বুঝতে পারেনি। মাজুখাতুনের উক্তিতে মোতালেফের শঠতা, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র সবই ধরা পড়েছে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "মাজু খাতুন মোতালেফ এর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক মাত্র; সে স্ত্রীর শ্রম ও শরীর দখল করেছে। তার দিক থেকে সম্পর্কের কোনো গ্রন্থি তৈরি হয়নি।"[১৮]

মোতালেফ যথাসময়ে ফুলবানুকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। আর মাজুখাতুনের আশ্রয় হয় প্রাক্তন স্বামী মৃত রাজেকের ঘর। মোতালেফের আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু মাজুখাতুনের দিনের বেলায় গৃহকর্মের ব্যস্ততায় সময় কাটলেও রাতের অবসর সময় আর কাটতে চায় না। সে মোতালেফের অভাব গভীরভাবে অনুভব করে। মাজুখাতুনের যৌন ও নিঃসঙ্গতার মনস্তত্ত্বের দিকে লেখক ইঙ্গিত করেছেন—

> "... দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না।"[১৯]

মোতালেফের বিশ্বাসঘাতকতা তার কাছে আর গোপন থাকে না। মাজুখাতুনের মানসিক স্থিতি অনুধাবন করতে পেরে রাজেকের দাদা ওয়াহেদের ঘটকালিতে প্রৌঢ় মাঝি নাদির শেখের সঙ্গে তার পুনর্বার বিয়ে হয়ে যায়। মাজুখাতুনের বিয়ের খবর শুনে মোতালেফের মনে হল আপদ গেছে। এদিকে রূপমুগ্ধ মোতালেফ ফুলবানুকে সুখে সোহাগে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু পরের বার শীতে তার হুঁশ হয়, ফুলবানু রস তৈরিতে অপারগ। সে অন্য বারের মতোই

গাছে চড়ে রস নামিয়ে আনে, কিন্তু ফুলবানুর অপটু হাতে উত্তম গুড় তৈরি হয় না। মোতালেফ স্ত্রীর উদ্দেশে রুক্ষস্বরে বলে ওঠে—

> "কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না।"[২০]

ফুলবানুর গুড় বানানোয় অক্ষমতা মোতালেফকে অস্থির ও বিরক্ত করে তোলে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি বাড়ে। তার পেশার কাছে তার রূপমুগ্ধতা পরাজিত হয়। এদিকে পুরনো খদ্দেররা মোতালেফের কাছে এসে অভিযোগ করে, তার এবারের গুড়ে গতবারের মতো স্বাদ নেই। গতবারের গুড়ের স্বাদ যেন জিহ্বায় লেগে আছে। গল্পকার এখানে মোতালেফের মনোবিশ্লেষণ করেছেন—

> "বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে।"[২১]

সে এর কারণ ভালো করে জানে। তাই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে সে ফুলবানুকে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ফুলবানু তাতে বিরক্ত হয়। এবার হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে যায় মাজুখাতুনের কথা। আগের বার রাতে শুয়ে শুয়ে সে মাজুখাতুনের সঙ্গে রস ও গুড় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। মোতালেফের মনে মাজুখাতুনের অভাববোধ জেগে ওঠে যা গল্পকার সযত্নে তুলে ধরেছেন—

> "মাজুখাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।"[২২]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে যখন একদিন মোতালেফ আবিষ্কার করে ফুলবানুর অসাবধানতার জন্য উনানে বসানো জালার মধ্যে রস পুড়ে গেছে। ফুলবানু তখন স্নান সেরে কেশবিন্যাস করছিল। তা দেখে মোতালেফ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে কঞ্চি দিয়ে ফুলবানুর সর্বাঙ্গে প্রহার করতে লাগল। এলেম শেখ খবর পেয়ে আসে, জামাতাকে শাসায়, মেয়েকেও গালমন্দ করে। কিন্তু ফুলবানু পিতার কাছে অনুরোধ জানায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে ফুলবানু সাগ্রহে ও সানন্দে মোতালেফের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল, মোতালেফের ঘরে যার সুখ-সোহাগের সীমা ছিল না, সেই ফুলবানু স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আর এখানে থাকতে চাইল না। এখানে ফুলবানুর মনস্তত্ত্বের দিকটি সুপরিস্ফুট। কিন্তু পিতার কথায় তাকে স্বামীগৃহেই থেকে যেতে হল। মোতালেফও ফুলবানুর সঙ্গে আপোস করে নিল। কিন্তু দুজনের মধ্যেকার মনের সম্পর্ক যেন ভেঙে গেল। দুজনেই যেন দুজনের সঙ্গে অভিনয় করতে লাগল। তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, মুগ্ধতা, প্রশ্রয় সবকিছুই যেন তলানিতে এসে ঠেকেছে। গল্পকার মোতালেফ ও ফুলবানুর ভদ্রতার মুখোশের পেছনে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো।"[২৩]

এদিকে রসের মরশুম প্রায় শেষ হয়ে আসে। ভোরবেলায় গাছে উঠে সে রসভর্তি বড়ো বড়ো হাঁড়ি নামিয়ে আনে, কিন্তু তার গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না। মোতালেফ জানে তার পরিশ্রমে কোনো খামতি নেই, বরং যা খামতি আছে ফুলবানুর হাতেই। মোতালেফ এবার অনুভব করে মাজুখাতুনের যোগ্যতা। সুন্দরী ফুলবানুর প্রতি দুর্বার আকর্ষণেই মোতালেফ গুণবতী মাজুখাতুনকে অমর্যাদা করেছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে, শুধু রূপ দিয়ে ঘর চলে না, গুণের দ্বারাই সংসারের মঙ্গলসাধন হয়। ফলে মাজুখাতুনের যথার্থ মূল্য অনুধাবনে তার মধ্যে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে তার গুড়ের সুখ্যাতি নষ্ট হওয়ায় ও আর্থিক ক্ষতিসাধনে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। গল্পকার যথাযথভাবে মোতালেফের এই সময়ের মনঃসমীক্ষণ করেছেন—

> "ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। … রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।"[২৪]

নাদির শেখের সঙ্গে একদিন হাটে দেখা হলে মোতালেফ জোর করে তার ঘরের জন্য গুড় দিয়ে পাঠায়। প্রবঞ্চক প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে গুড় নিয়ে আসার জন্য মাজুখাতুন নাদিরের উপর ক্রুদ্ধ হয়। কয়েকদিন পর একদিন

মোতালেফ দুই হাঁড়ি রস নিয়ে একেবারে নাদির শেখের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই মাজুখাতুন তীব্র বাক্যবাণের দ্বারা পরোক্ষে তাকে আঘাত করল। কিন্তু মোতালেফের মনে তার অভিঘাত এসে লাগল না। বরং সে মাজুখাতুনের ধিক্কারবাণীর মধ্যে অনুভব করল এক অপরিসীম মাধুর্য। মোতালেফ মাজুখাতুনের সেই সময়কার মনোজগতের স্বরূপ ঠিকই ধরতে পেরেছে—

> "... মনে হচ্ছিল ... মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।"[২৫]

শেষোক্ত বাক্যে ব্যঞ্জনা প্রয়োগে মাজুখাতুনের মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মোতালেফের কাছ থেকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করার পরও তার প্রতি মাজুখাতুনের অন্তরের ভালোবাসা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। মোতালেফ এবার তার এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। সে খেজুরের রস নিয়ে এসেছে এই আশায় যে মাজুখাতুন যদি তার সুযোগ্য হাতের ছোঁয়ায় সেই রসের দ্বারা গুড় বানায়, তবে সে তা হাটে বিক্রি করে আগের বারের মতোই নাম কিনবে। গতবার মাজুখাতুন থাকায় তার খ্যাতি ও আয়ে যেন জোয়ার এসেছিল। কিন্তু এবার ফুলবানুর অক্ষমতায় তার সুনাম ও রোজগার দুটোতেই ভাটা পড়েছে। আসলে মোতালেফের কাছে তার পেশাই তার নেশা। সেই পেশা যখন অন্যের অকর্মণ্যতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেটা সে মেনে নিতে পারেনি। নিজের সেই ব্যর্থতার দুঃখ ও গ্লানিতে তার চোখে জল চলে এল। বাঁখারির বেড়ার আড়ালে দাঁড়ানো মাজুখাতুনের চোখ দুটিও ছল ছল করে উঠল। মোতালেফ সেদিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। একে তো মাজুখাতুনের ভালোবাসার মানুষটি সামনে রয়েছে, মনের দুঃখ প্রকাশ করছে, সর্বোপরি তার প্রতিভার কদর করছে— মাজুখাতুনের চোখের জলের নেপথ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার মনোজগতের কিছু ভাব। সবশেষে হুঁকো হাতে নিয়ে বসে থাকা মোতালেফকে যখন নাদির শেখ জিজ্ঞেস করেছে কল্কের আগুন নিভে গেছে নাকি, তখন মোতালেফ উত্তরে বলেছে, হুঁকোতে তামাক নেভেনি। এই ব্যঞ্জনা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লেখক গল্পের একেবারে শেষে মোতালেফ ও মাজুখাতুনের অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন— কারো অন্তরেই ভালোবাসার আগুন নিভে যায়নি। 'রস' গল্পে মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুর মনোজগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বাইরের মোড়ক এবং ভিতরের অসারতা গল্পের স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন—

> "নরেন্দ্রনাথ যথার্থই সম্পর্কতত্ত্বের সংবেদনশীল কারিগর।"[২৬]

মানুষের শঠতা, স্বার্থপরতা, লোভ, ভোগ, রূপজ আকর্ষণ, প্রেম, ত্যাগ, প্রত্যাখ্যান, বিমুখতা— মনোগহনের এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই গল্পের তিনটি চরিত্রে এবং সূক্ষ্মভাবে তাদের মনোবিশ্লেষণ করেছেন।

উপসংহার:

আধুনিক ছোটোগল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ শতকীয় ধারা চরিত্রের বহিরঙ্গ বর্ণনার সীমা অতিক্রম করে তাদের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব অন্বেষণে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারা কল্লোল যুগ পার হয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর সমসাময়িকদের রচনায় পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে কল্লোল যুগ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতি লেখকদের প্রবণতা দেখা যায় বেশি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায় যেমন ফ্রয়েডকে অনুসরণ করা হয়েছে, তেমনি তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর 'গল্পমালা' সংকলনের বিভিন্ন গল্পেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আলোচ্য গবেষণাপত্র মূলত এই দিকটিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'গল্পমালা' সংকলনের দুটি নির্বাচিত গল্প 'যৌথ' ও 'রস' অবলম্বনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনোবিশ্লেষণের রীতির সফল প্রয়োগ এই পত্রে দেখানো হয়েছে। গল্পগুলোতে চিত্রিত অনুরূপ, স্বরূপ, মল্লিকা, মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানু চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের মনোবিশ্লেষণধর্মী কৌশলের প্রগাঢ়তাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রচিত্রণে তিনি মনোবিকলনতত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করেছেন এবং চরিত্রের গোপন মানসিক প্রবাহকে উন্মোচিত করতে পেরেছেন। বস্তুত লেখক চরিত্রের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটনে সিদ্ধহস্ত। এভাবেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটোগল্পকার হিসেবে তাঁর সার্থকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৩৭৪।
২. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৭৬।
৩. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ৪১৯-৪২০।
৪. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৩।
৫. তদেব, পৃ. ১৬।
৬. তদেব, পৃ. ১৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৩।
৮. তদেব, পৃ. ১৫।
৯. তদেব, পৃ. ১৫।
১০. তদেব, পৃ. ১৫।
১১. তদেব, পৃ. ১৫।
১২. তদেব, পৃ. ১৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১৮।
১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৮০।
১৫. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৬৯।
১৬. তদেব, পৃ. ৭০।
১৭. তদেব পৃ. ৭০।
১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৬।
১৯. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৭১।
২০. তদেব, পৃ. ৭৪।
২১. তদেব, পৃ. ৭৪।
২২. তদেব, পৃ. ৭৪।
২৩. তদেব, পৃ. ৭৫।
২৪. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬।
২৫. তদেব, পৃ. ৭৭।
২৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ২৭৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা ১। আনন্দ, ১৯৮৬, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায়, সতাচরণ। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ। প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৭, কলকাতা।
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, কলকাতা।
৩. মিত্র, সরোজমোহন। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১১, কলকাতা।
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা।